মধ্যবর্তী সামষ্টিক অর্থনৈতিক কর্মকাঠামো

কতোটা বাস্তবসম্মত

৩ বছর মেয়াদি মধ্যবর্তী সামষ্টিক অর্থনৈতিক কর্মকাঠামোর ভিত্তিতে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার কথা বলা হয়েছে পিআরএসপিতে। কতোটা বাস্তবসম্মত ও বাস্তবায়নযোগ্য হবে এই কর্মকাঠামো? ... লিখেছেন **আসজাদুল কিবরিয়া**

অন্তর্বর্তীকালীন দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে (আইপিআরএসপি) ২০০২-২০০৩ অর্থবছর থেকে ২০০৪-২০০৫ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ের জন্য তিন বছর মেয়াদি একটি মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কর্মকাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো এই সময়কালে দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যক্রম একটি পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনার সাহায্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, যেখানে বার্ষিক বাজেটের কাজটিও একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার আলোকে করা সম্ভব হবে। এই কর্মকাঠামোতে প্রধান সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকগুলো নির্দিষ্ট করে এগুলো অর্জনের জন্য কার্যকর নীতিমালা প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। উচ্চহারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে এবং বাজেট ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে রেখে সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা নিয়ে আসার দীর্ঘদিনের প্রত্যাশাটি এখানে ফুটে উঠেছে। এ ধরনের একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা গেলে তা অবশ্যই কাজের কাজ হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বাস্তবে তা সম্ভব হবে কিনা বা সরকার আদৌ তা করবে কিনা। বিশেষ করে রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সরকারের ওপর প্রথম থেকেই যেভাবে চাপ থাকে বা সরকার যেভাবে এ বিষয়ের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ থাকে তাতে জনস্বার্থমূলক বিষয়গুলো কতোটা অর্জন করা যাবে সে নিয়ে সংশয় দেখা দেবেই। অবশ্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব আনিসুল হক চৌধুরী অনেকটা জোর দিয়েই বলেছেন যে এরকম একটি ৩ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা নির্ধারিত থাকলে সরকার চাইলেও সহজে এর বাইরে গিয়ে কিছু করতে পারবে না। বরং সরকারকে এর আওতার মধ্যে থেকেই বিভিন্ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করতে হবে। সম্প্রতি ঢাকায় এফবিসিসিআইতে ব্যবসায়ীদের এক কর্মশালায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি আরো বলেন,' এটা ঠিক যে পিআরএসপির বিষয়টি দাতাদের চাহিদা। কিন্তু এটা আমরা আমাদের জন্যই তৈরি করেছি। দাতাদের নির্দেশনা অনুসারে নয় বরং সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকজনের সঙ্গে মতবিনিময় করেই আইপিআরএসপিটা তৈরি হয়েছে। সুতরাং মধ্যবর্তী সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় স্বাভাবিকভাবেই জনমতের একটি প্রতিফলন থাকছে।'

প্রবৃদ্ধির বার্ষিক হার ৭%

'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসনের একটি জাতীয় কৌশল' শিরোনামে সরকার অন্তর্বর্তীকালীন দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রের খসড়ায় আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পরিমাণ অর্ধেকে নামিয়ে আনার জন্য এ সময়কালে বার্ষিক ৭% হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের কথা বলা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে মধ্যবর্তী সামষ্টিক অর্থনৈতিক কর্মকাঠামোতে ২০০২-০৩ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন করা হয়েছে ৫.৬%। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে এটি ৬% এবং ২০০৪-০৫ অর্থবছরে এটি ৬.৩% অর্জন করার কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিআইডিএস-এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. বিনায়ক সেন বলেন, ' শুধু প্রবৃদ্ধি অর্জন করে যেমন দারিদ্র্য কমানো সম্ভব নয়, তেমনি প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানো না গেলে দারিদ্র্য বিমোচন অসম্ভব। গত দশকে গড়ে বার্ষিক ১% হারে দারিদ্র্য কমেছে। বর্তমান প্রবৃদ্ধির হার অব্যাহত রাখলে দারিদ্র্য হ্রাসের এই হারও অব্যাহত থাকবে। ফলে দারিদ্র্যের বর্তমান হার অর্ধেকে নামিয়ে আনতে গেলে আরো প্রায় ২৫ বছর লেগে যাবে। আর তাই প্রবৃদ্ধির হারও বাড়াতে হবে।' প্রসঙ্গত, ড. বিনায়ক আইপিআরএসপি প্রণয়নে কনসালটেন্টের দায়িত্ব পালন করেছেন।

দারিদ্র্য হ্রাসের সঙ্গে জিডিপি প্রবৃদ্ধির সম্পৃক্ততার বিষয়টি অবশ্য নতুন কিছু নয়। বিভিন্ন সময়ে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এ নিয়ে কথা বলছে। আইএমএফয়ের বাংলাদেশ আবাসিক প্রতিনিধি ম্যারন ভ্যারোভেন সম্প্রতি বলেছেন যে '৯০-র দশকে বাংলাদেশে দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে আর তা সম্ভব হয়েছে এই দশকে গড়ে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৫% হারে অর্জিত হওয়ায়। তিনি আরো বলেছেন, 'প্রবৃদ্ধির হার ৬% থেকে ৬.৫%-এ উন্নীত করা গেলে বাংলাদেশ ২০১৫ সালের আগেই চরম দারিদ্র্য সীমা অনেক কমিয়ে আনতে পারবে।' আইপিআরএসপিতে দাতাদের এ কথারই প্রতিফলন উঠে এসেছে চমৎকার ভাবে।

আইএমএফ আবাসিক প্রতিনিধির ভাষায়, 'বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ) নির্ধারিত কার্যকর হারে বা ৮৮৫ ডলারে উন্নীত করতে হলে আগামী ২৫ বছরে গড়ে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার হতে হবে ৬% থেকে ৬.৫%। এই লক্ষ্য

'শুধু প্রবৃদ্ধি অর্জন করে যেমন দারিদ্র্য কমানো সম্ভব নয়, তেমনি প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানো না গেলে দারিদ্র্য বিমোচন অসম্ভব। গত দশকে গড়ে বার্ষিক ১% হারে দারিদ্র্য কমেছে। বর্তমান প্রবৃদ্ধির হার অব্যাহত রাখলে দারিদ্র্য হ্রাসের এই হারও অব্যাহত থাকবে। ফলে দারিদ্র্যের বর্তমান হার অর্ধেকে নামিয়ে আনতে গেলে আরো প্রায় ২৫ বছর লেগে যাবে। আর তাই প্রবৃদ্ধির হারও বাড়াতে হবে'

ড. বিনায়ক সেন
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, বিআইডিএস

অর্জন করতে হলে বাংলাদেশকে উৎপাদনশীলতায় ব্যাপক উন্নতি ঘটাতে হবে। আর তা সম্ভব হবে স্থিতিশীল সামষ্টিক অর্থনীতির পরিবেশে দ্রুত কাঠামোগত সংস্কার, উন্নত শাসন ও পর্যাপ্ত অবকাঠামো বিনির্মাণের মাধ্যমে।' তার মতে, যদি এই ধারায় প্রবৃদ্ধি অর্জনের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় তাহলে দারিদ্র্য বিমোচন করা সহজ হবে।

বাংলাদেশের দারিদ্র্যের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরে আইএমএফ আবাসিক প্রতিনিধি আরো বলেন, '২০০০-২০০১ সালে বাংলাদেশে মোট জনগোষ্ঠীর ৩৪% ছিল চরমভাবে দরিদ্র বা দারিদ্র্য সীমার নিচে যে হার ১৯৯১-৯২ সালে ছিল ৪৩% আর মোট জনগোষ্ঠীর ৫০% দরিদ্র যে হার ১৯৯১-৯২ সালে ছিল ৫৯%। পল্লী অঞ্চলে দারিদ্র্য হার ব্যাপকভাবে হ্রাস পেলেও এটি এখনও নগর দারিদ্র্যের চেয়ে বেশি।'

তার মানে দেখা যাচ্ছে, দাতাগোষ্ঠীর ভাব-ভাষা বেশ ভালোভাবেই আমাদের আইপিআরএসপিতে আরোপ করা হয়েছে। এমন নয় যে এ চিন্তাগুলো অযৌক্তিক বা অসম্ভব। প্রশ্ন হলো, দাতাগোষ্ঠীর মতো করে যখন সমস্যা চিহ্নিত করা হয়, তখন তাদের মতো করে সমস্যা সমাধানের দিকেও অগ্রসর হতে হয়। আর সেখানেই দেখা দেয় যতো বিপত্তি।

ভ্যারোভেন অবশ্য বলেছেন, দরিদ্র জনসংখ্যার দিক দিয়ে চীন ও ভারতের পর বাংলাদেশের অবস্থান যার মাথাপিছু আয় মাত্র ৩৬৬ ডলার। বস্তুত, দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য বাংলাদেশকে এখনও অনেক কিছু করতে হবে। দ্রুতহারে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য প্রয়োজন উচ্চহারের টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন।

কিছু বৈপরীত্য

আইপিআরএসপির খসড়ার মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কর্মকাঠামো পর্যালোচনা করতে যেয়ে বেশ কিছু বৈপরীত্য ও নেতিবাচক দিক বেরিয়ে এসেছে যা থেকে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে এরকম অবস্থায় কিভাবে আসলে সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব হবে।

মধ্যবর্তী সামষ্টিক অর্থনৈতিক কর্মকাঠামোয় বাজেট ঘাটতি ২০০২-০৩ অর্থবছরে জিডিপির ৫.২% থেকে ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ৪.৮%-এ নামিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমানও চলতি অর্থবছরের জাতীয় বাজেট পেশকালে বলেছিলেন, 'সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে বাজেট ঘাটতি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে সীমিত করা হবে। নতুন অর্থবছরের বাজেট ঘাটতি জিডিপি ৪%-এ সীমিত থাকবে।' বাস্তবে অবশ্য তা সম্ভব হয়নি। কৌশলপত্রে এই ঘাটতি অর্থায়নে ২০০২-০৩ অর্থবছরে মানে চলতি অর্থ বছরে অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন ৩% ও বিদেশী অর্থায়ন ২.২% ধার্য করা হয়েছে। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে এই অর্থায়ন হবে যথাক্রমে ২.৭% ও ২.৩% হারে যা ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ধরা হয়েছে ২.৭% ও ২.০%। তার মানে বাজেট ঘাটতি কমিয়ে আনার সঙ্গে সঙ্গে ঘাটতি অর্থায়নে বিদেশী উৎসের ওপরও নির্ভরতা কমিয়ে আনা হবে। কিন্তু রাজস্ব ব্যয়ের যে প্রাক্কলন করা হয়েছে সেখানে সুদ ব্যয় খাত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বাজেট অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ ঋণের ওপর নির্ভরতাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কারণ ২০০২-০৩ অর্থবছরে ৩ হাজার ৭৮১ কোটি টাকা অভ্যন্তরীণ সুদ ব্যয় ধার্য করা হয়েছে যা ২০০৪-০৫ অর্থবছরে গিয়ে দাঁড়াবে ৪ হাজার ৭২ কোটি টাকায়। একইভাবে বিদেশী সুদ বর্তমান অর্থবছরের জন্য ১ হাজার ৬৪ কোটি ধার্য করায় হয়েছে যা ২০০৪-০৫ অর্থবছরে গিয়ে দাঁড়াবে ১ হাজার ১৫৫ কোটি টাকায়। সুদ ব্যয় বাড়ার মানেই হলো ঋণের বোঝা বাড়া। তাহলে বাজেট ঘাটতি কমিয়ে আনার সুফলটা মিলবে কিভাবে তা নিয়ে একটি প্রশ্ন উঠতেই পারে। প্রসঙ্গত, ১৯৯২-৯৩ অর্থবছরে সরকারি ব্যয় মেটানোর ক্ষেত্রে প্রায় ৪৩ শতাংশ অর্থায়ন করতে হয়েছিল ঋণের মাধ্যমে। এর মধ্যে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে সরকারের নিট ঋণের অংশ ছিল প্রায় ২ শতাংশ। অথচ ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে তা বেড়ে হয় ১০ শতাংশ। আলোচ্য সময়কালে সরকারি ব্যয়ের অর্থায়নকারী হিসেবে ঋণের অংশ কমে ৩৬ শতাংশে নেমে এলেও অভ্যন্তরীণ ঋণ কমেনি। আর এই ব্যয় হয়েছে বেতন-ভাতাসহ অনুন্নয়ন ব্যয় খাতে।

আবার ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেট থেকে ৪১৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে অভ্যন্তরীণ সুদের দায়ভার মেটাতে। ১৯৯১-৯২ অর্থ বছরে এই খাতে ৫৬৫ কোটি টাকা ব্যয় করলেও ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে তা উন্নীত হয় ১০৪০ কোটি টাকায়। আবার ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে ১০৮০ কোটি টাকা রাজস্ব ব্যয় করতে হয়েছে অভ্যন্তরীণ সুদ বাবদ। এরপর বছর বছর তা লাফিয়ে বেড়েছে। ২০০০-২০০১ অর্থবছরের বাজেটে এই খাতে ২ হাজার ৯২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখলেও বাস্তবে তা লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গিয়ে হয় ৩ হাজার ৩০৬ কোটি টাকা। দেখা যাচ্ছে, ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে যেখানে মোট রাজস্ব ব্যয়ের ৮ শতাংশ গেছে অভ্যন্তরীণ সুদ বাবদ সেখানে ২০০০-২০০১ অর্থবছরে তা ১৫ শতাংশে উপনীত হওয়াকেও কি ঋণ নির্ভরতার বিপর্যয় বলা যাবে না? তারচেয়ে বড় কথা ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে যেখানে মোট রাজস্ব ব্যয়ের ১৪ শতাংশই গেছে সুদ খাতে যা এক দশকে বেড়ে হয়েছে ১৯ শতাংশ।

আইপিআরএসপিতে দেখানো হয়েছে যে, চলতি অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহ হবে ২৪২ কোটি ডলার। এই রেমিট্যান্স প্রবাহ ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ২৬২ কোটি ডলার ও ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ২৮৩ কোটি ডলারে উন্নীত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। বর্তমানে অর্থনীতির অন্যতম নির্ভরযোগ্য খাত এই রেমিট্যান্স। সুতরাং এর ওপর গুরুত্ব দেয়াটা যৌক্তিক বলেই গণ্য হতে পারে। তবে চলতি অর্থবছরের জন্য সরকার ইতিমধ্যে ৩০০ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স প্রবাহ আশা করছে এবং এরকম একটি লক্ষ্যমাত্রা বাংলাদেশ ব্যাংকে বেঁধে দেয়া হয়েছে। যদি বাস্তবে তা অর্জিত হয় তাহলে খুবই ভালো কথা। সেক্ষেত্রে

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কর্মকাঠামো : প্রাক্কলন

	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫
জিডিপি প্রবৃদ্ধি	৫.৬%	৬%	৬.৩%
মূল্যস্ফীতি	৩.১%	৩.৫%	৪.২%
মোট রাজস্ব (জিডিপির%)	৯.৮%	১০.৭%	১২.৪%
মোট ব্যয় (জিডিপির%)	১৫.৯%	১৬.৬%	১৭.২%
বাজেট ঘাটতি (জিডিপির%)	-৫.২%	-৫%	-৪.৮%

সূত্র: আইপিআরএসপি, এপ্রিল ২০০২

'এটা ঠিক যে পিআরএসপির বিষয়টি দাতাদের চাহিদা। কিন্তু এটা আমরা আমাদের জন্যই তৈরি করেছি। দাতাদের নির্দেশনা অনুসারে নয় বরং সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকজনের সঙ্গে মতবিনিময় করেই আইপিআরএসপিটা তৈরি হয়েছে। সুতরাং মধ্যবর্তী সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় স্বাভাবিকভাবেই জনমতের একটি প্রতিফলন থাকছে'

আনিসুল হক চৌধুরী
সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

'বাংলাদেশে '৯০-র দশকে দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে আর তা সম্ভব হয়েছে এই দশকে গড়ে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৫% হারে অর্জিত হওয়ায়। 'প্রবৃদ্ধির হার ৬% থেকে ৬.৫%-এ উন্নীত করা গেলে বাংলাদেশ ২০১৫ সালের আগেই চরম দারিদ্র্য সীমা অনেক কমিয়ে আনতে পারবে'

ম্যারন ভ্যারোভেন
আবাসিক প্রতিনিধি, আইএমএফয়ের বাংলাদেশ

আইপিআরএসপি চূড়ান্ত করার সময় এ বিষয়টি নজরে এনে সংশোধনী দিতে হবে।

দারিদ্র্য বিমোচনে শিক্ষাখাতকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়ার কথা বলা হয়েছে। আইএমএফ আবাসিক প্রতিনিধি ভ্যারোভেনও এ প্রসঙ্গে স্পষ্ট বলেছেন, 'টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্বার্থে শিক্ষাখাতে ব্যয় বাড়িয়ে মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশকে উদ্যোগী হতে হবে।' আইপিআরএসপি অনুসারে চলতি অর্থবছরের শিক্ষাখাতে সরকারের ব্যয় জিডিপির ২.৪২% যা ২০০৪-০৫ অর্থবছরে গিয়ে ২.৭৬% হবে। তার মানে বছরে ০.৫০% হারেও শিক্ষাখাতে ব্যয় বাড়ানোর নির্দেশনা বা পরিকল্পনা নেই? অথচ একটি কার্যকর গুণগত মাননিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির অভাব এবং মৌলিক শিক্ষা সামগ্রীর সুনির্দিষ্ট মানদন্ডহীনতা শিক্ষার অবস্থাকে আরো নিচের দিকে ঠেলে দিয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধেকেরও বেশি শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত। প্রতি ১০ জন শিশুর মধ্যে ৪ জনই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে। প্রতি ১০ জন শিশুর মাত্র ৪জন ঠিকমতো লিখতে ও পড়তে পারে।

বলা হয়ে থাকে, মোট জাতীয় আয়ের অন্তত ৫.৫% শিক্ষাখাতে ব্যয় হওয়া উচিত। অথচ বাংলাদেশে ব্যয় হচ্ছে ৩%-এর কম। এবং এটি দ্রুত বাড়িয়ে তোলার কোনো কার্যকর পরিকল্পনা পিআরএসপিতে অনুপস্থিত দেখা যাচ্ছে। অথচ দেশে প্রাথমিক শিক্ষাখাতে ব্যয় হওয়া প্রতিটি টাকার প্রায় পুরোটাই যায় শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের বেতন দিতে। শিক্ষা বাজেটের ৯৮.৯% ব্যয় হয় শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা বাবদ। বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা বজায় থাকা এবং সরকারি বিদ্যালয়, বেসরকারি বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, ক্যাডেট কলেজ প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কারণে প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষাখাতের মাথাপিছু ব্যয় বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাথাপিছু ব্যয় যেখানে ১ হাজার টাকারও কম সেখানে ক্যাডেট কলেজে এই ব্যয় ৫০ হাজার টাকার বেশি।

সবচে' বড় কথা, বিশ্বের মধ্যে শিক্ষাখাতে সবচে' কম অর্থ ব্যয় করে যেসব দেশ তাদের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাত্র ২০ শতাংশ মৌলিক শিক্ষায় সরকারি ব্যয়ের অংশ ছাড় করাতে পারে। সুতরাং দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার আলো ছড়ানোর জন্য শিক্ষার ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে বাড়াতেই হবে। পিআরএসপি চূড়ান্ত করার প্রাক্কালে এ বিষয়টি ভেবে দেখা প্রয়োজন।

সংশোধন প্রয়োজন

তাহলে দেখা যাচ্ছে, শুধু মধ্যবর্তী সামষ্টিক অর্থনৈতিক কর্মকাঠামোয় পরিকল্পনাগত দিকে বেশ কিছু বৈপরীত্য বা বৈসাদৃশ্য রয়েছে যা দারিদ্র্য দূরীকরণের কাজে আর যাই হোক সহায়ক হবে না। এ বিষয়গুলো আরো পর্যালোচনা করে সংশোধন করার সুযোগ এখনও রয়েছে। তবে সমস্যা হলো, ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে খসড়াটি চূড়ান্ত করার কথা বলা হয়েছে। এই সময়কালের মধ্যে এটি দাতাগোষ্ঠীর হাতে দিয়ে তাদের সন্তুষ্ট করে ৫০ কোটি ডলার পাওয়া নিশ্চিত করার জন্য সরকার যেরকম তাড়াহুড়ো করছে তাতে এ বিষয়গুলো ঠিকমতো গুরুত্ব পাবে কিনা সেটাই ভেবে দেখা প্রয়োজন। জাতীয় স্বার্থে এই সময়সীমা আরো বাড়ানোর বিষয়টিও উপেক্ষা করার নয়।

■ পিআরএসপি বিষয়ক ধারাবাহিক প্রতিবেদনগুলো **অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ** ও **সাপ্তাহিক ২০০০**-এর একটি যৌথ উদ্যোগ

পিআরএসপি জরিপ

সরকার একটি দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) প্রণয়নের কাজ করছে। দাবি করা হচ্ছে, এটি দেশের মানুষের সঙ্গে আলোচনা-পরামর্শ করে চূড়ান্ত করা হবে। বাস্তবে অবস্থাটা ভিন্ন। সবকিছুই হচ্ছে মূলত দাতাদের নির্দেশে আর আমলাদের নিয়ন্ত্রণে। এই প্রেক্ষিতে পিআরএসপি সম্পর্কে জনসাধারণের সম্যক ধারণার একটি চালচিত্র তুলে আনতে সাপ্তাহিক ২০০০ এই জরিপের আয়োজন করেছে। আপনার অংশগ্রহণ আমাদেরকে ধারণা দেবে সরকার কর্তৃক গৃহীত দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র সম্পর্কে জনমত কেমন।

উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন

১। আপনি কী পিআরএসপি সম্পর্কে কিছু জানেন?
☐ হ্যাঁ ☐ না

২। আপনি কি মনে করেন সরকার দারিদ্র্য বিমোচনের বিষয়ে সত্যিই আন্তরিক?
☐ হ্যাঁ ☐ না

৩। আপনি কি মনে করেন আগের সরকারগুলোর মতো দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র সরকারের একটি রাজনৈতিক কৌশল মাত্র?
☐ হ্যাঁ ☐ না

৪। আপনি কি মনে করেন বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের পরামর্শ অনুযায়ী বাংলাদেশের দারিদ্র্য কমবে?
☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর পাঠানোর শেষ সময় : ৩০ আগস্ট

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা : পিআরএসপি জরিপ, **সাপ্তাহিক ২০০০**, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০